বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের করণীয়

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদভী (রহ.)

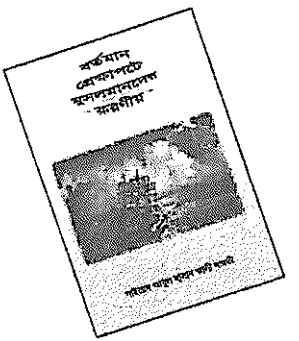

অনুবাদ
জুলফিকার আলী নাদভী
খাদেম ও খলীফা, সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদভী

প্রকাশনায় : কোরক প্রকাশন, ৬/১২ ব্লক-এ, লালমাটিয়া
বর্ণায়ন, রুম ৭২৮ সুবাস্তু আর্কেড, ৪৬-৪৮ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা
ফোন : ০১৬৮৪ ২৭৭১৯৯, ০১৭১২ ৯৩৪০৭৭
প্রথম প্রকাশ : রবিউল আউয়াল ১৪৩৬ হিজরী, ডিসেম্বর ২০১৪ ঈসায়ী
বিনিময় : ১৫ টাকা

অনুবাদকের কথা

মুফাক্কিরে ইসলাম আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদভী (র.) ও তাঁর রচনাসমূহকে নতুন করে পরিচয় করাবার আর প্রয়োজন নেই। তাঁর গ্রন্থসমূহ তুরস্ক, মিশর, তিউনিসিয়া, লিবিয়া সহ বিভিন্ন দেশে ইসলামী জাগরণে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। আর সারা বিশ্বে তা সহীহ ইসলামী দাওয়াতের আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে।

বর্তমান মুসলিম উম্মাহর করণীয় কী, এই বিষয়ে বিভিন্ন জনের সাথে অনেক আলোচনা হয়েছে। এ ধারাবাহিকতায় একদিন মুহ্সিন ভাইয়ের সাথে আলোচনা হয়। তিনি এ সম্পর্কে আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদভীর (র.) মতামত জানতে চান। বিষয়টিতে হযরতের কোনো লেখা থাকলে তার অনুবাদ করার দাবী জানান। আমি খুঁজতে খুঁজতে দু'টি গ্রন্থে এ আলোচনাগুলো পেয়ে গেলাম এবং আল্লাহর মেহেরবানিতে দ্রুত অনুবাদ কাজ সম্পূর্ণ করলাম। মুহ্সিন ভাই অনুবাদকে সাবলীল করার জন্য যথেষ্ট সময় ব্যয় করেছেন। আল্লাহ্ তাকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন।

আশা করি বইটি পাঠ করে পাঠকমাত্রই চিন্তা ও কর্মব্যস্ততার খোরাক পাবেন। সেই সাথে এখনই সবার কাজে নেমে পড়ার কামনা ও দোয়া করি।

বিনীত
জুলফিকার আলী নাদভী
শিক্ষক, মাদরাসাতুল হুদা
বাসাবো, ঢাকা

২৬ সফর, ১৪৩৬ হিজরী

সূচী

বিশ্বে মুসলমানদের অস্তিত্ব হুমকির মুখে ◈ ৪

এখনো জ্বলছে আশার আলো ◈ ৬

সংকট নিরসনের পথ ◈ ৭

১. তাওবা ◈ ৮

২. গুনাহ পরিহার ও হক আদায় করা ◈ ৯

৩. অমুসলিমদের মাঝে ইসলামের দাওয়াত ◈ ১০

৪. নাগরিক হিসেবে পরস্পর সহযোগিতা করা ◈ ১১

৫. সবর ও কুরবানী ◈ ১২

৬. নতুন প্রজন্মের দ্বীনী শিক্ষার ব্যবস্থা করা ◈ ১২

৭. রূহানী ও মানসিক শক্তির অধিকারী হওয়া ◈ ১৪

৮. সমাজ সংস্কারমূলক কর্মপন্থা গ্রহণ ◈ ১৫

৯. ইসলামী সালিশকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ◈ ১৯

১০. ইসলামী শরিয়তের অনুসরণ ও বাস্তবায়ন ◈ ২০

১১. নতুন দাওয়াত ও নতুন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ◈ ২০

১২. দরদী জামা'আত ◈ ২২

আর দেরী নয় ◈ ২৪

বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের করণীয়

বিশ্বে মুসলমানদের অস্তিত্ব হুমকির মুখে

বর্তমানে গোটা মুসলিম বিশ্ব এক ভয়ানক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। বিশেষতঃ আমাদের ভারতবর্ষের অবস্থা আরো নাজুক। অথচ এই উপমহাদেশ কয়েক শতাব্দী যাবত মুসলিম শাসনাধীন ছিল। তখন তা মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইজ্জত-সম্মানের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এ সময় এখানে এমন সব শক্তিশালী ইসলাহী ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম গড়ে ওঠে, এমন সব মুজাদ্দেদ ও বিশ্ববিখ্যাত আল্লাহওয়ালা আলেম জন্মগ্রহণ করেন, যাঁদের দাওয়াত ও সংস্কারের প্রভাব বিশ্বব্যাপী প্রতিফলিত হয়। কিন্তু এখন এখানে ইসলাম ও মুসলিম সমাজ কঠিন অস্তিত্ব সংকটের সম্মুখীন। ইতঃপূর্বে তারা কখনো এমন অবস্থায় পড়েনি। শত শত বছরের ইতিহাসে এর কোনো নজীর নেই। এ কঠিন সময়ে মুসলমানদের ধর্মীয় ঐতিহ্য, দাওয়াত ও তাবলীগের সুযোগ ও সম্ভাবনা এবং দেশ ও সমাজকে সুপথে পরিচালিত করার যোগ্যতা ও সক্ষমতা হুমকির মুখে। শুধু তাই নয়, এদেশে ন্যূনতম জীবন ধারণের সুযোগ, দৈহিক অবস্থান, ইজ্জত-আবরু, মসজিদ-মাদরাসা এবং শত শত বছরের ধর্মীয় গ্রন্থাদি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল্যবান সম্পদ পর্যন্ত আজ হুমকির সম্মুখীন।

এখানে মুসলমানেরা দূর-দূরান্তের গ্রাম-গঞ্জেতো অস্তিত্ব সংকটে রয়েছেই; এমনকি ঐ সকল বড় বড় কেন্দ্রীয় শহর, যেখানে তারা বিশাল সংখ্যায় বসবাস করে, বিশেষত্বের দাবীদার এবং দেশের সুনাম-সুখ্যাতি অর্জনেও বড় ভূমিকা পালন করেছে, সেখানেও তারা কিছুদিন যাবত আতঙ্ক ও অস্থিরতার মধ্যে জীবন যাপন করছে। কোথাও কোথাও তো তাদের অবস্থা কুরআনের এ আয়াতের বাস্তব চিত্রে পরিণত হয়েছে – কুরআন তাদের সম্পর্কে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী শৈল্পিক ও মুজেজাময় ভাষাশৈলিতে বর্ণনা করছে,

ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ ●

"দুনিয়া তার বিশাল প্রশস্ততা সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে পড়ে।" – সূরা তাওবা : আয়াত ১১৮।

এর চিত্র যদি বিগত শতাব্দিতে পাওয়া গিয়ে থাকে, তাহলে তা ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দী মুতাবেক তের খ্রিস্টাব্দে পাওয়া যাবে। কারণ তখন তাতারিরা তুর্কিস্থান, ইরান ও ইরাকের উপর বর্বর আক্রমণ করেছিল। তারা তখন শহরের পর শহর বাতিহীন করে দিয়েছিল। দালানকোঠাকে মাটির সাথে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। আর মুসলিম বিশ্বের চুলাগুলোকে ইঁদুরের গর্তে পরিণত করেছিল। কিন্তু তা ছিল একটি বর্বর হিংস্র সেনাদলের ধ্বংসাত্মক হত্যাযজ্ঞ। তাদের সাথে কোনো দাওয়াত ও সংস্কৃতি ছিল না। কোনো ধর্ম-দর্শনের প্রতি বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িক মনোভাব ছিল না। পরিকল্পিত ভাবে কোনো জাতি-গোষ্ঠিকে চিরতরে শেষ করার ইচ্ছাও ছিল না। আবার তাদের নিকট কোনো সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য সভ্যতা-সংস্কৃতিও ছিল না।

এদিকে সে সময় সৌভাগ্যক্রমে আল্লাহওয়ালা, রূহানী শক্তির অধিকারী, মুখলেস ও প্রভাব সৃষ্টিকারী দ্বীনের দা'ঈ ও মুবাল্লিগগণ বিদ্যমান ছিলেন। তাঁদের প্রভাবে ও সোহবতের বরকতে গোটা তাতারী জাতি ইসলাম কবুল করে; যাদের লোকসংখ্যা তৎকালে কয়েক লক্ষ ছিল। অতঃপর তারা ইসলামের নিষ্ঠাবান পতাকাবাহী, প্রচারক ও সংরক্ষকে পরিণত হয়। এমনকি তারা বহুসংখ্যক সুবিশাল ও শক্তিশালী ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করে।

বিখ্যাত ইতিহাসবিদ টি. ডব্লিও. এ্যরনল্ড তার 'ইসলামী দাওয়াত' গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, "কিন্তু ইসলাম আবার স্বীয় অতীত হারানো শান শওকত ফিরে পায়। ইসলামের ওয়াজকারিগণ ঐ বর্বর ও হিংস্র তাতারিদেরকে মুসলমান বানাতে সক্ষম হয়, যারা মুসলমানদের উপর ধ্বংসাত্মক হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল।"

আজকের প্রেক্ষাপটে, বিশেষত যেখানে মুসলমানেরা এক সময় রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী ছিল এবং বর্তমানে সংখ্যালঘু হিসেবে বসবাস করছে, সেখানে তাদের অবস্থা অন্যান্য মুসলিম দেশের চেয়ে ভিন্ন ও নাজুক। সেখানে তারা ও তাদের ইতিহাস রাজনীতি ও গবেষণা-সন্ত্রাসের শিকার হয়েছে। এখন তা যেভাবে জাতির সামনে তুলে ধরা হয়েছে, তাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে হিংসা, ঘৃণা ও প্রতিশোধ গ্রহণের মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছে। আবার অন্যদিকে সে দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অথবা মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী ও দিকনির্দেশনা প্রদানকারী সংস্থা ও সংগঠন সমূহ নাম ও খ্যাতির আশায় ভারসাম্যহীন জযবা, অপরিণামদর্শী উন্মাদনা ও দাঙ্গা-ফাসাদের মত ভুল করতেও কার্পণ্য করেনি। ফলে সেদেশে মুসলমানেরা কঠিন ধর্মীয় বিদ্বেষ ও সম্প্রদায়িকতার মুখে পড়েছে এবং ইসলামী সভ্যতা ও ঐতিহ্য সেখানে কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন।

এরই পাশাপাশি সে দেশে সাহিত্য-সাংবাদিকতা, শিক্ষানীতি ও প্রচারমাধ্যমের সহযোগিতায় মুসলিম নবপ্রজন্মকে প্রথমে আদর্শহীন ও ঐতিহ্যহীন করার প্রচেষ্টা চালান হচ্ছে। এরপর ধীরে ধীরে তাদেরকে ধর্মহীন ও ঈমানহীন মুরতাদ বানাবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে এবং তা কার্যকর করার প্রচেষ্টা চলছে। এ ঘটনা কেবল ধর্মীয় আত্মমর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিদের জন্যই শংকা ও উদ্বেগের কারণ নয়; বরং তা একজন সাধারণ মুসলমানের জন্যও শংকা-উদ্বেগের কারণ। আমরা প্রতিদিন পত্রিকাতে যে সকল ঘটনা পড়ছি এবং আমাদের আশপাশে যা ঘটে যাচ্ছে তা আমাদের সকলকেই মর্মাহত ও উদ্বিগ্ন করে তুলছে। এ সকল ঘটনা অনেক সময় হতাশ করে, আবার অনেক সময় অবস্থার সামনে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে।

এখনো জ্বলছে আশার আলো

কিন্তু মুসলমানেরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এবং তাঁরই হাতে বিশ্ব কারখানা। তিনিই তাঁর দ্বীনের হেফাজতকারী, হকের পৃষ্ঠপোষক এবং মজলুমদের সাহায্যকারী। তিনিই পদদলিতদের পুনরুদ্ধারকারী এবং অবাধ্য ও অহংকারীদের মস্তক অবনতকারী। তার শান হল, اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ "মনে রেখ, সৃষ্টিজগৎ তাঁরই এবং বিধানও তাঁর।" -- সূরা আ'রাফ : আয়াত ৫৪।

সুতরাং তাঁর জন্য যেকোন ঘটনা ও অবস্থার পরিবর্তন সাধন করা কঠিন বিষয় নয়। তাঁর ব্যাপারে মুসলমানেরা সাক্ষ্য প্রদান করে,

قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ ز وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ط بِيَدِكَ الْخَيْرُ ط إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ • تُوْلِجُ اللَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى اللَّيْلِ ز وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ز وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ •

"বলুন, হে আল্লাহ! হে বাদশাহদের বাদশাহ! আপনি যাকে চান তাকে বাদশাহী প্রদান করেন, আর যার থেকে চান বাদশাহী ছিনিয়ে নেন। যাকে চান তাকে ইজ্জত প্রদান করেন, আর যাকে চান তাকে বেইজ্জত করেন। সকল প্রকার কল্যাণ আপনার হাতে। আর নিশ্চয় আপনি সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান।"

"আপনিই রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান, আর আপনিই দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান। আপনিই প্রাণহীন বস্তু থেকে জীবন্ত প্রাণী সৃষ্টি করেন, আর আপনিই জীবন্ত প্রাণী হতে প্রাণহীন বস্তু সৃষ্টি করেন। আপনিই যাকে খুশি তাকে অসংখ্য ধনভাণ্ডার প্রদান করেন।" –সূরা আলে ইমরান : আয়াত ২৬-২৭।

এমনি ভাবে একটি পরাজিত ও বিপর্যস্ত জাতির বিজয়ের এবং একটি বিজয়ী জাতির পরাজয়ের ঘোষণা প্রদান, যখন এমন কোনো লক্ষণ ও সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হচ্ছিল না এবং এ ধরনের কোনো পূর্বাভাস প্রদানের কারো দুঃসাহসও ছিল না, তখন কুরআন মাজীদ সুস্পষ্টভাবে এ ভবিষ্যদ্বাণী প্রদান করে –

لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُ ؕ وَ يَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ۞ بِنَصْرِ اللّٰهِ ؕ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۞

"আগে ও পরে আল্লাহরই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়। আর সেদিন মুমিনরা আনন্দিত হবে। আল্লাহর সাহায্যে। আর তিনি যাকে চান তাকেই সাহায্য করেন। আর তিনিই পরাক্রমশালী ও পরম দয়াবান।" – সূরা রূম : আয়াত ৪-৫।

সপ্তম খ্রিস্টাব্দের শুরুতে ইরানের বাইজেন্টাইন সরকার রোম, মিশর ও পূর্ব ইউরোপের উপর পরিপূর্ণ বিজয় লাভ করে। ঠিক এমন সময় ইরানের পরাজয় ও পশ্চাৎপদতার দিকে এবং রোমানদের বিজয়ের দিকে এ আয়াতে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। নবুওয়াতের পঞ্চম বছর মুতাবেক ৬১৬ খ্রিস্টাব্দে, রোমানদের মৃত্যুঘণ্টা বাজার সময় কুরআন এ ভবিষ্যদ্বাণী প্রদান করে যে, তারা এখন থেকে নয় বছরের মধ্যেই বিজয় লাভ করবে। বাস্তবেও এমনই হয়েছিল। একজন ইউরোপিয়ান ইতিহাসবিদ গীবন উল্লেখ করেন –

"ইরানী বিজয়ের ভরা যৌবনকালে মুহাম্মদ এ ভবিষ্যদ্বাণী প্রদান করেন যে, কয়েক বছরের মধ্যেই রোমান পতাকা সমহিমায় উড্ডীন হবে। যখন এ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়, তখন এ থেকে অসম্ভব ও যুক্তিহীন আর কোনো কথা ছিল না। কারণ হিরাক্লিয়াসের প্রথম দশ বৎসরের পরিস্থিতি সাম্রাজ্যের নিকটবর্তী ধ্বংস ও শেষ পরিণতির ঘোষণা প্রদান করছিল।"

সংকট নিরসনের পথ

অবস্থার পরিবর্তন সাধন এবং প্রতিদিনের প্রত্যক্ষ বিপদ ও আশংকাসমূহ হতে উত্তরণের একটি খোদায়ী বিধান রয়েছে। এজন্য তাঁর প্রেরিত মানবতার সর্বশেষ

নবীর (স.) শিক্ষা, সুন্নাহ ও উত্তম আদর্শ রয়েছে। সেই সাথে রয়েছে প্রিয়নবীর (স.) হাতে গড়া মহামানবদের কর্মপন্থা। এই প্রবন্ধে কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবীদের কর্মপন্থার আলোকে বিদ্যমান সংকট থেকে উত্তরণের কতিপয় শর্ত ও দিকনির্দেশনা উল্লেখ করা হল।

১. তাওবা

বর্তমানে বিশ্বের সকল মুসলমানের জন্য, বিশেষ করে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য সর্বপ্রথম কর্তব্য হল আল্লাহর নিকট তাওবা করা। আল্লাহর নিকট ইস্তেগফার করা ও অনুতপ্ত হয়ে ক্রন্দন করা। কুরআন মাজীদে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ ط اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ ۞

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা সবর ও নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য কামনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।" – সূরা বাকারা : আয়াত ১৫৩।

অন্য একটি আয়াতে রয়েছে,

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ ۞

"বল দেখি কে অস্থির অসহায় মানুষের দোয়া কবুল করেন, যখন তাকে ডাকে? আর কে তার দুঃখ-বেদনা দূর করেন এবং কে তোমাদেরকে পূর্ববর্তিদের স্থলাভিসিক্ত করেছেন?" – সূরা নাম্‌ল : আয়াত ৬২।

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ط عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ۞

"হে ঈমাদারগণ! আল্লাহর সামনে খাঁটি তাওবা কর। এতে অবাক হবার কী আছে যে, তোমাদের রব তোমাদের গুনাহসমূহকে মিটিয়ে দিবেন।" – সূরা তাহরীম : আয়াত ৮।

যখন কোনো পেরেশানী আসত, তখন স্বয়ং প্রিয়নবীর (স.) নামাজ আদায় করার অভ্যাস ছিল। তখন প্রিয়নবী (স.) দ্রুত নামাজ ও দোয়াতে মশগুল হয়ে যেতেন। এ মর্মে হযরত হুযাইফা (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ (ص) اِذَا حَزَبَهُوْ اَمْرٌ صَلَّى •

"যখনই রাসূলের (স.) কোনো পেরেশানী আসত, তখনই তিনি নামাজ আদায় করতেন।" – আবু দাউদ, আস্-সুনান, হাদীস ১৩২১।
হযরত আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে,

كَانَ النَّبِيُّ (ص) اِذَا كَانَ لَيْلَةً رِيْحٌ شَدِيْدَةٌ كَانَ مَفْزَعُهُوْ اِلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى تَسْكُنَ الرِّيْحُ وَ اِذَا حَدَثَ فِي السَّمَاءِ حَدَثٌ مِنْ خُسُوْفِ الشَّمْسِ اَو الْقَمَرِ كَانَ مَفْزَعُهُوْ اِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى يَنْجَلِيَ •

"প্রিয় নবীর (স.) মুবারক অভ্যাস ছিল যে, যখন রাতে কোনো ঝড়-তুফান আসত, তখন তিনি মসজিদে আশ্রয় নিতেন। আর ঝড়-তুফান বন্ধ হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করতেন।"

"আবার যখন আকাশে সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণ হতো তখন প্রিয়নবী (স.) নামাজের প্রতি মনোযোগী হতেন। গ্রহণ শেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি নামাজে মশগুল থাকতেন।" – জালালুদ্দীন সুয়ূতীকৃত জামিউল আহাদীস।

এ কারণে বর্তমান প্রেক্ষাপটে দোয়া ও মুনাজাত এবং কুরআন তেলাওয়াতের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করা উচিত। বিশেষ করে ঐ সকল সূরা ও আয়াতের আমল গুরুত্ব সহকারে করা উচিত যেগুলোতে নিরাপত্তা, বিজয় ও সাহায্যের বিষয় উল্লেখ রয়েছে। যেমন সূরা কুরাইশ, ফীল ও দোয়ায়ে ইউনূসের আমল অধিক পরিমাণে করা উচিত।

২. গুনাহ পরিহার ও হক আদায় করা

দ্বিতীয় শর্ত ও জরুরী পদক্ষেপ হল মুসীবত থেকে তাওবা করা, গুনাহ পরিহার করা এবং হকসমূহ আদায় করা। এ প্রসঙ্গে এখানে খলিফা হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীযের (র.) একটি নির্দেশ উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করছি। তিনি নির্দেশটি একজন সেনাপ্রধানের নিকট প্রেরণ করেছিলেন। তিনি উল্লেখ করেন –

"আল্লাহর বান্দা উমর ইবনে আব্দুল আযীযের পক্ষ থেকে মানসুর ইবনে গালিবের নিকট; যাকে তিনি শত্রু ও সন্ধি ভঙ্গকারী যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রেরণ করেছেন।"

"তার প্রতি তিনি এ নির্দেশ প্রদান করছেন যে, সর্বাবস্থায় তাকওয়া অবলম্বন করবে। কারণ আল্লাহর ভয়ই হল উত্তম উপকরণ, প্রভাবশালী কৌশল এবং প্রকৃত শক্তি।"

"তাই আমীরুল মু'মিনীন নির্দেশ প্রদান করছেন যে, নিজের ও নিজের অধীনস্তদের ব্যাপারে দুশমনের তুলনায় গুনাহকে অধিক ভয় করবে। কারণ গুনাহ দুশমনের কৌশল অপেক্ষা মানুষের জন্য অধিক ভয়ংকর।"

"আমরা যখন দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াই করি, তখন আমরা তাদের গুনাহের কারণে তাদের উপর বিজয় লাভ করি।"

"সুতরাং তারা এবং আমরা সকলেই যদি গুনাহে লিপ্ত থাকি, তখন তারা শক্তি ও সংখ্যায় আমাদের থেকে অধিক হবার কারণে আমাদের উপর বিজয় লাভ করবে।"

"তাই নিজের গুনাহ অপেক্ষা অন্য কারো দুশমনির ব্যাপারে অধিক সর্তক থেক না।"

"যতটুকু সম্ভব নিজের গুনাহর চেয়ে অন্য কোনো কিছু নিয়ে অধিক চিন্তিত হবে না।"[১]

৩. অমুসলিমদের মাঝে ইসলামের দাওয়াত

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল অমুসলিমদের মাঝে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করা এবং তাদের সামনে ইসলামের পরিচয় তুলে ধরা।

এ কাজের ক্ষেত্রে কোনো সুযোগকে হাতছাড়া হতে দেওয়া উচিত নয়। কারণ আমাদের নিকট সর্ববৃহৎ শক্তি রয়েছে; আর তা হল স্বভাবসুলভ, যুক্তিসঙ্গত, আকর্ষণীয়, হৃদয়গ্রাহী, দিলদেমাগ পরিতৃপ্তকারী দ্বীন। রয়েছে কুরআন মাজীদের মত মুজেজাময় আসমানী গ্রন্থ। আরো রয়েছে শেষ নবীর (স.) মনোমুগ্ধকর ও মনমাতানো সীরাত, ইসলামের গ্রহণযোগ্য ও আমলযোগ্য শিক্ষাব্যবস্থা।

এগুলো যদি কেউ মুক্ত মন ও স্বচ্ছ মস্তিষ্ক নিয়ে অধ্যয়ন করে, তবে তা স্বীয় প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে। কারণ ইসলাম এক সময় বিশাল-বিস্তৃত অঞ্চলের সভ্য ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী জনগোষ্ঠিকে নিজের আশেক ও আত্মোৎসর্গকারিতে

---

[১] লেখকের 'তারিখে দাওয়াত ও আযীমত' ১ম খণ্ড : পৃষ্ঠা ৪৫-৪৬। আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলীর (র.) অনুবাদে 'সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস'।

পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিল। আর অসংখ্য মানুষ ও শক্তিমান-সমৃদ্ধশালী-সুসভ্য রাষ্ট্র গভীর অনুরক্ত হয়ে ইসলামের দা'ঈ-মুবাল্লিগ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

এটি একটি তিক্ত সত্য কথা যে, এ দেশের মুসলমানেরা দাওয়াতের এই দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে, এমনকি এই দায়িত্ব-সচেতনতার ক্ষেত্রে অনেক অবহেলা করেছে। এর ফলে এ দেশের অধিকাংশ নাগরিক ইসলামের দৈনন্দিন পালনীয় ইবাদত সম্পর্কেও অজ্ঞ রয়ে গেছে। আজান ও নামাজ যা গ্রামগঞ্জ, শহর-বন্দর এবং বড় বড় মহল্লাতে দৈনিক পাঁচবার হয়ে থাকে তা সম্পর্কে তারা যেসব প্রশ্ন করে থাকে, তা শ্রবণ করে তাদের নির্বুদ্ধিতা নিয়ে হাসাহাসি করার পরিবর্তে নিজেদের দায়িত্বহীনতার কারণে ক্রন্দন করা উচিত। তারা যে এ সকল বিষয় সম্পর্কে কতটুকু অজ্ঞ তা কল্পনা করা যায় না। যারা অধিক পরিমাণে সফর করে এবং অমুসলিমদের সাথে অধিক মেলামেশা করে, তাদের ক্ষেত্রে এমনটা অহরহ ঘটে থাকে।[২]

সুতরাং তাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করার জন্য যে সকল পুস্তক রচনা করা হয়েছে তা তাদের মাঝে বিতরণ করা যেতে পারে।[৩]

৪. নাগরিক হিসেবে পরস্পর সহযোগিতা করা

অনেক দেশে মুসলমানগণ শত শত বছর যাবত বসবাস করে আসছে। বাহ্যতঃ তাদেরকে সে দেশেই বসবাস করতে হবে। তাই সেখানে সেদেশের নাগরিক হিসেবে পরস্পর সাহায্য-সহযোগিতা করা এবং পরস্পর মিলেমিশে বাস করার গুরুত্ব রয়েছে। সেখানকার মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা, ইজ্জত-আবরুর হেফাজত ও মানবতার সম্মান প্রতিষ্ঠার প্রবক্তা ও পতাকাবাহী হিসেবে আমাদের কাজ করা প্রয়োজন। এভাবে ঐ সকল দেশে স্থিতিশীল পরিবেশ বজায় থাকবে এবং শান্তি ও

---

[২] লেখক এ ধরনের একটি অভিজ্ঞতার কথা 'হিন্দুস্তানী মুসলমান এক নজর মেঁ' নামক একটি পুস্তিকাতে উল্লেখ করেছেন। তাতে তিনি এ ব্যাপারে নিজেদের অবহেলার অভিযোগ করেছেন।

[৩] উদাহরণস্বরূপ মাওলানা মুহাম্মদ মনযুর নোমানীর 'ইসলাম কেয়া হ্যায়', লেখকের 'হিন্দুস্তানী মুসলমান এক নজর মেঁ', 'রহমতে আলম' ও 'মুহসিনে আলম (স.)', মাওলানা সৈয়দ সুলাইমান নদভীর 'রাসূলে ওয়াহদাত'। এ সকল পুস্তিকার হিন্দী ও ইংরেজী অনুবাদ হয়েছে। আবার মাওলানা কাজী মুহাম্মদ সুলাইমান মানছুরপুরীর 'রাহমাতুললিল আলামীন', ড. হামিদুল্লাহ সাহেবের ইংরেজী সীরাত গ্রন্থ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

নিরাপত্তা বিরাজ করবে। বরং সেখানে ইজ্জত-সম্মানের সাথে বসবাস করা সম্ভব হবে।

এমন না হলে বহু ধর্ম ও সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত ঐ সকল দেশে স্থিতিশীল পরিবেশ বজায় রাখা এবং শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করা সম্ভব নয়। সুনাম ও উন্নতি তো অনেক পরের বিষয়।

৫. সবর ও কুরবানী

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল মুসলমানদের সন্ধি, সবর ও ত্যাগের মনোভাব নিয়ে বসবাস করা উচিত।

বিশেষ করে তারা যেখানে সংখ্যালঘু হয়ে বাস করে এবং সবসময় বিপদ ও আশংকার মাঝে জীবন যাপন করে, সেখানে এ মনোভাব আরো তীব্র হওয়া উচিত। বরং সেখানে একটু বেশিই ত্যাগ ও দানশীলতা, বীরত্ব ও সাহসিকতা, আল্লাহর জন্য সবর ও সহিষ্ণুতার মনোভাব, সওয়াব ও জান্নাতের আশা, আল্লাহর দিদারের তামান্না এবং আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাতের জযবা নিয়ে জীবন যাপন করা উচিত।

এ জন্য সাহাবীদের (রা.) জীবনী, ইসলামের সংগ্রামী সাধকদের জীবন ও কর্ম অধ্যয়ন করা এবং তা অন্যদেরকে শুনাবার ব্যবস্থা করা জরুরী। কারণ তারা আল্লাহর রাস্তায় অসংখ্য কষ্ট সহ্য করেছিলেন এবং অসংখ্য ত্যাগ ও কুরবানী প্রদান করেছিলেন। তারা এগুলোকে সর্বোত্তম আমল এবং আল্লাহর নৈকট্য ও জান্নাত লাভের সর্ববৃহৎ ওসীলা মনে করতেন।

কিছুদিন পূর্বেও শিক্ষিত ও দ্বীনদার পরিবারে 'ফুতুহুশ শাম' এর উর্দূ কাব্যগ্রন্থ 'ছমছামুল ইসলাম' পড়ে শুনানো হতো এবং মাহফিলেও তা গাওয়া হতো। এর অনেক প্রভাব পরিলক্ষিত হতো। এখনো শাইখুল হাদীস মাওলানা জাকারিয়ার (র.) 'হেকায়েতে সাহাবা', হাফিজ জালেন্দারী রচিত 'শাহনামায়ে ইসলাম' ও লেখকের 'যব ঈমান কী বাহার আঈ'[৪] গ্রন্থসমূহ থেকে এ কাজ নেওয়া যেতে পারে। এ সকল গ্রন্থ মসজিদ ও মাহফিলে এবং নিজ নিজ ঘরে পাঠ করে শুনাবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৬. নতুন প্রজন্মের দ্বীনী শিক্ষার ব্যবস্থা করা

[৪] আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলীর (র.) অনুবাদে 'ঈমান যখন জাগল'।

একটি অতি জরুরী বিষয় হল পরিবারের দায়িত্বশীল, সকল পিতামাতা এবং দেশের শিক্ষিত সমাজের দায়িত্ব হল নতুন প্রজন্মের জন্য দ্বীনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করা। তাদেরকে ইসলামী আকিদা-বিশ্বাস, শরীয়তের বিধি-বিধান, ইসলামী আখলাক-চরিত্র এবং ইসলামের অন্যান্য মৌলিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা নিজেদের দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করা।

এ বিষয়টিকে তারা যেন মানবীয় ও ইসলামী হিসেবে গ্রহণ করেন; যেমন তারা সন্তানের খানা-পিনা, লেবাস-পোষাক ও চিকিৎসার দায়িত্বকে গ্রহণ করে থাকেন এবং এর ব্যবস্থা করে থাকেন। আর বাস্তব সত্য কথা হল এই যে, তাদের জীবনে দ্বীনের প্রয়োজনীয়তা, তথা ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের শিক্ষা এবং সেই শিক্ষার হেফাজত ও শক্তিশালী করা তাদের দৈহিক ও মানসিক জরুরত পূর্ণ করা থেকেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

আর এ ব্যাপারে অবহেলা তাদের দৈহিক ও মানসিক জরুরতের ক্ষেত্রে অবহেলা বা শিথিলতা অপেক্ষা অধিক বিপদজনক। কারণ এর পরিণতি অতি ভয়াবহ হয়ে থাকে। কেননা দ্বীনের তালিম ও তরবিয়াত এবং সঠিক ইসলামী আকিদা-বিশ্বাসের হেফাজত করার বিষয়টি এক অনন্ত ও অবিনশ্বর জীবনের সাথে সম্পৃক্ত। এর মাধ্যমেই তারা সেখানে ভাল বা মন্দ পরিণতি ভোগ করবে। আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্ট ভাবে ইরশাদ করেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا ●

"হে ঈমানদারগণ! নিজেকে এবং নিজের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর।" – সূরা তাহ্‌রীম : আয়াত ৬।

একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِيْ ●

"তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের অধীনস্তদের ব্যাপারে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে।" – বুখারী, সহীহ; আহমাদ, মুসনাদ।

তাই ঘরে ঘরে, মহল্লা মহল্লাতে, মসজিদে মসজিদে, মকতবে মকতবে এবং মাদরাসা মাদরাসাতে শিশুকিশোরদের, বিশেষ করে স্কুলগামী ছেলেমেয়েদের জন্য ইসলামী শিক্ষার ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। প্রত্যেক আকেল ও বালেগ মুসলমান

এবং প্রত্যেক পরিবারের দায়িত্বশীলকে এ জিম্মাদারী কবুল করে এগিয়ে আসতে হবে।[৫]

৭. রূহানী ও মানসিক শক্তির অধিকারী হওয়া

শক্তি মূলতঃ দু'ধরনের হয়ে থাকে। একটি হল সামরিক শক্তি, আর অপরটি রূহানী ও মানসিক। একটি জীবন্ত ও আত্মমর্যাদাশীল জাতি তাদের সামরিক শক্তির উপর শেষ ভরসা করে থাকে। জীবন বাজী রেখে তারা এ শক্তিকে টিকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। তবু এ শক্তি জাতীয় জীবনে চূড়ান্ত অবদান রাখতে সক্ষম নয়। কোনো জাতির জীবনে বা যুদ্ধের কোনো ময়দানে সামরিক শক্তির পরাজয় বরণ করা বা পিছপা হওয়া জাতীয় পরাজয় বলে গণ্য হয়না। দুনিয়াতে বিভিন্ন জাতি রণাঙ্গনে কখনো পরাজয় বরণ করে, কখনো বিজয়ী হয়, আবার কখনো সেনাবাহিনীকে যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরিয়ে আনা হয়। নবুওতী যুগ থেকে শুরু করে সাহাবা কেরামের যুগে এবং ইসলামী ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে এ ধরনের উত্থান-পতন পরিলক্ষিত হয়। কারণ যে জাতি এ ধরনের উত্থান-পতনের সম্মুখীন হয়না এবং পরাজয়ের তিক্ততার সাথে যাদের কখনো পরিচয় ঘটেনি; বরং যারা সব সময় বিজয়ের স্বাদ গ্রহণ করেছে এবং বিজয়ের নেশায় মত্ত থেকেছে, সে জাতির যোগ্যতার উপর অধিক ভরসা করা যায় না। তাই যে কোনো জাতির প্রশিক্ষণের জন্য উভয় ধরনের অভিজ্ঞতা জরুরী। আর এ কারণে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাহবুব (স.) ও তাঁর প্রিয় সাহাবীগণের জীবনে এ ধরনের উত্থান-পতন বহুবার প্রদান করেছেন।

কিন্তু আত্মিক ও মানসিক শক্তির বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। কারণ কখনো কখনো মানসিক শক্তির পরাজয় ও তার পিছপা হওয়া জাতিকে শত শত বা হাজার হাজার বছর পিছনে নিয়ে চলে। অনেক সময় মানসিক পরাজয়ের কারণে তাদের ভাগ্যে পরাজয়ের মোহর মেরে দেওয়া হয়। তাই বর্তমানে ভারতবর্ষের মুসলমানদের মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ইসলামী ঐতিহ্য রক্ষার জন্য রূহানী ও মানসিক শক্তি প্রয়োজন। স্বতন্ত্র ইসলামী সভ্যতা সংরক্ষণের জন্য রূহানী ও মানসিক শক্তি প্রয়োজন। মুসলিম পার্সনাল ল' রক্ষার জন্য রূহানী ও মানসিক শক্তি প্রয়োজন। ভাষা ও সাহিত্যের জন্য রূহানী ও মানসিক শক্তি প্রয়োজন। নতুন প্রজন্মকে ইসলামী শিক্ষা প্রদানের জন্য রূহানী ও মানসিক শক্তি প্রয়োজন। আবার এ মানসিক শক্তির হেফাজত সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরাই করতে পারেন। কারণ এ কাজের জন্য যে ধরনের জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইল্‌ম ও আমল, বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা, উপলব্ধি ও অনুভূতি,

[৫] শুরু থেকে এ'পর্যন্ত অংশ 'জুহদে মুসালসাল' গ্রন্থের ৩৭০-৩৮৯ পৃষ্ঠা থেকে অনূদিত।

দূরদৃষ্টি ও বাস্তবতা অনুধাবন করার শক্তি এবং এ কর্ম সাধনের জন্য যে ধরনের উপায়-উপকরণ প্রয়োজন – তা এই বিশেষ শ্রেণীর নিকট রয়েছে। তাদের অন্তরের ব্যথা-অস্থিরতা, যথাসময়ে তাদের কর্তব্য সচেতন হওয়া ও প্রস্তুতি গ্রহণ করার ফলে অনেক সময় কিছুদিনের জন্য হলেও বিপদ দূরে সরে যায় এবং মুসলিম উম্মাহ মুক্তি পেয়ে যায়। আবার তাদের সামান্য অসতর্কতা ও অবহেলার কারণে উম্মাহর এ কাফেলা বর্ষ ও শতাব্দীর হিসাবে কক্ষপথ হতে বিচ্যুত হয়ে যেতে পারে। সুতরাং তারা যদি নিজেদের ব্যক্তি স্বার্থ ও উদ্দেশ্যকে মুসলিম উম্মাহর স্বার্থের চেয়ে এবং নিজের ব্যক্তিগত বিপদকে উম্মাহর বিপদের চেয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করেন তাহলে এ শক্তির পরাজয় চূড়ান্ত হয়ে যায়।

৮. সমাজ সংস্কারমূলক কর্মপন্থা গ্রহণ

এটি একটি বাস্তব সত্য কথা যে, ইসলাম গুটিকয়েক আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগীর মাঝে সীমাবদ্ধ নয়। বরং ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ও সমাজ ব্যবস্থা। এর সম্পর্ক নারী-পুরুষ সকলের সাথে এবং সকল দেশ ও যুগের মুসলমানের সাথে। তাই মুসলমানদের জীবনের সকল দিক ও গতিধারা ইসলামের ছাঁচে গড়ে ওঠা উচিত। কারণ এ জীবন ব্যবস্থা ও সমাজ পদ্ধতি আল্লাহর সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (স.) কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য নিয়ে আগমন করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা প্রদান করেছেন,

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْناً ●

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের জন্য আমার নিয়ামতকেও পরিপূর্ণ করে দিলাম; আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম। – সূরা মায়েদা : আয়াত ৩।

আর এ হেকমতের কারণেই আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক যুগের নবীগণকে মানুষের আকৃতিতে প্রেরণ করেছেন। যাতে তাঁরা স্বীয় উম্মত ও অনুসারীদের জন্য অনুকরণীয় ব্যক্তি হতে পারেন। নিজ নিজ দেশ ও সমাজের জন্য আদর্শ হতে পারেন। বিভিন্ন মন ও মেজাজের লোকদের জন্য অনুসরণীয় ব্যক্তি হতে পারেন। স্বয়ং সাইয়্যেদুল মুরসালিন ও খাতামুন নাবিয়্যীনকেও (স.) গোটা বিশ্বমানবতার জন্য পরিপূর্ণ অনুকরণীয় ব্যক্তি হিসেবে প্রেরণ করেছেন। ফলে প্রিয়নবীকে (স.) মানব সমাজের যাবতীয় অবস্থা ও জীবনের সকল শাখাপ্রশাখার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। যেমন –

রোগশোক, সুস্থতা ও অসুস্থতা, যৌবন ও বার্ধক্য, স্বচ্ছলতা ও অস্বচ্ছলতা, যুদ্ধ ও সন্ধি, বৈবাহিক জীবন, সন্তান লালনপালন, কন্যাদের বিবাহ-শাদী, সন্তানদের ইন্তেকাল ইত্যাদি। আবার আল্লাহ তা'আলা এ সকল ঘটনা সহীহ সনদের সাথে সীরাত ও হাদীসের কিতাবের মাধ্যমে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। এ ধরনের নমুনা পূর্বের সাধু-সন্ন্যাসীদের জীবনে তো দূরের কথা, আর কোনো নবীর জীবনেও পাওয়া অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ۞

"তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে; ঐ সকল লোকদের জন্য যারা আল্লাহ ও আখেরাতের ভয় করে এবং যারা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে যিকির করে।" – সূরা আহযাব : আয়াত ২১।

প্রিয়নবীর (স.) জীবদ্দশাতেই দারুল হিজরত মদীনা তাইয়্যেবাতে একটি ইসলামী সমাজ গড়ে ওঠে। এই সমাজে ছিল জীবন ও জীবন ধারণের সকল উপাদান। ছিল স্বচ্ছলতা ও দরিদ্রতা, সক্ষমতা ও ব্যর্থতা, শক্তি ও সামর্থ্য। সেখানে ছিল যৌবন ও বার্ধক্য, জাতিগত ও গোষ্ঠিগত মতবিরোধ, ছিল রুচি ও মেজাজের ভিন্নতাসহ একটি জীবন্ত উদ্যমী সমাজ। এভাবে একটি আদর্শ সমাজ প্রিয়নবীর (স.) দশ বছরের পবিত্র জীবনে গড়ে উঠেছিল এবং তা খুলাফায়ে রাশেদার যুগ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল।

সে সমাজে স্বাভাবিক ভাবে বিবাহশাদী হতো, তালাক হতো। মেয়েকে বিবাহের পরে পাত্রস্থ করা হতো এবং বধুবরণও করা হতো। সে সমাজে বিবাহের সময় মোহরানা নির্ধারণ করা হতো এবং কোনো না কোনো নামে মেয়েকে বিবাহ উপলক্ষে হাদিয়া প্রদান করা হতো। পিতামাতার ইন্তেকালের পর মীরাস বণ্টন করা হতো। ব্যবসাবাণিজ্য, চাষাবাদ ও বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশীদারির ব্যবস্থাও ছিল। মোট কথা জীবন সেখানে তার সকল গতিধারা নিয়েই প্রবাহিত ছিল। নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে এর জীবন্ত প্রতিবেদন পরিলক্ষ করা যেতে পারে।

সে সমাজের একজন সাহাবী আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.)। তিনি ছিলেন আশারায়ে মুবাশশারা বা জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীর একজন। একদিন তিনি স্বাভাবিক নিয়মে প্রিয়নবীর (স.) খেদমতে হাজির হলেন। তো প্রিয়নবী (স.) তার কাপড় থেকে বিবাহের খোশবু পেলেন। তিনি তখন জিজ্ঞেস করলেন, আব্দুর

রহমান! কী ব্যাপার, তোমার পোষাক থেকে এক ভিন্ন ধরনের ঘ্রাণ পাওয়া যাচ্ছে? তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি বিবাহ করেছি।

প্রিয় নবী (স.) তার এ উত্তরে কোনো ধরনের বিস্ময় প্রকাশ না করে শুধুমাত্র ইরশাদ করেন, أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ : "একটি ছাগল জবাই করে হলেও ওয়ালিমা অবশ্যই করবে।" – বুখারী, সহীহ, হাদীস ১৯৪৩।

এ ঘটনা সুস্পষ্টভাবে আলোকপাত করে যে, বিবাহ-শাদির বিষয়টি কোনো হৈ চৈ করার মত বা স্মরণীয় উৎসবের মত কোনো বিষয় নয়। তাই এ অনুষ্ঠানে শহরের সকল লোককে দাওয়াত করতে হবে, সকল আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করতে হবে, অন্যথায় বিবাহ হবে না বা এটা চরম পর্যায়ের অপরাধ মনে করা হবে – এমন নয়। আবার এখানে খরচের ও ধুমধামের একটি ব্যাপার থাকে; যার মাধ্যমে সমাজে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরা হয়ে থাকে – কিন্তু ইসলাম সে মানসিকতাকে সমর্থন করে না।

মদীনা তাইয়্যেবার অনুকরণীয় আদর্শসমাজ ও জীবনপদ্ধতি দীর্ঘদিন যাবৎ বলবৎ ছিল। যতদিন পর্যন্ত তারা অমুসলিম সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত হননি এবং তাদের মধ্যে নাম-যশ ও খ্যাতির মানসিকতা জন্ম নেয়নি, ততদিন মুসলিম সমাজের এ রূহ ও মানসিকতা বিরাজমান ছিল। এমন সাদামাটা বিয়েশাদী ও জীবনধারণ পদ্ধতি মুসলিম সমাজের সর্বত্রই পরিচিত ছিল। সাধারণত মসজিদেই বিবাহের রেওয়াজ ছিল। অনেক সময় কোনো নামাজ-কালে হঠাৎ ঘোষণা আসত যে, নামাজের পরে অমুকের বিবাহ হবে, আপনারা সকলে উপস্থিত থাকবেন। আবার কখনো তো পরিবারের সকল সদস্যকে খবর জানাবার সুযোগও হতো না।

কিন্তু একসময় মুসলমানেরা এমন সব দেশে যেয়ে বসবাস শুরু করল, যেখানে ভিন্ন ধরনের সমাজ ব্যবস্থা ছিল; বিয়েশাদীর অন্য স্টাইল ছিল; ইজ্জত ও সম্মান নিয়ে গর্ব করার মেজাজ ছিল; সুনাম-সুখ্যাতি, প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রতি আকর্ষণ ছিল। অথবা ঐ সকল দেশের সমাজব্যবস্থা সনাতন রীতিনীতি অনুযায়ী ছিল। সেখানে দীনধর্মের তুলনায় সনাতন রসম-রেওয়াজ ও রীতিনীতির অধিক প্রভাব ছিল এবং এক্ষেত্রে ধর্মের ঠিকাদার ও ধর্মের পতাকাবাহীদের যথেষ্ট শিথিলতা ও অলসতা ছিল; বরং এতে তাদের বড় ধরনের ভূমিকা ছিল।

তো মুসলমানদের এ ধরনের সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনে যেখানে বিরাট অবদান রাখা দায়িত্ব ছিল, সেখানে তারা উল্টো ঐ সকল রসম-রেওয়াজ, রীতিনীতি, সমাজব্যবস্থা এবং পরিবেশ-পরিস্থিতির শিকারে পরিণত হয়। ফলে তারা বিবাহশাদীর মত পবিত্র সুন্নাতকে একটি মেলাতে পরিবর্তন করে ফেলল। আর

এজন্য তারা সুদ গ্রহণ করা, জমি বন্ধক রাখা বা বিক্রয় করতেও কুণ্ঠা বোধ করেনি। আবার সেখানে সব ধরনের ইসলামবিরোধী কাজ ও বেহায়াপনার সমাবেশ ঘটে। অথচ ইসলাম এর কোনটাই পছন্দ বা সমর্থন করে না। বরং ইসলাম বিবাহশাদীকে সহজ সরলভাবে সম্পাদন করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছে এবং প্রিয়নবী (স.) ও শরীয়তের ব্যাখ্যা প্রদানকারীগণ এ ধরনের ইসলামবিরোধী কাজ ও বেহায়া রীতিনীতিকে নিন্দা করেছেন।

এক্ষেত্রে আরো ভয়ানক ও নিন্দনীয় বিষয় এবং আরো অধিক চিন্তার বিষয় হল বর্তমান সমাজে অধিক পরিমাণে যৌতুকের দাবী। এ দাবী এখন মুসলিম সমাজব্যবস্থাতেও তীব্র হতে চলেছে। আবার এ যৌতুক আদায়ের ক্ষেত্রে ঘৃণিত ও নিন্দনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। অনেক সময় দাবী আদায়ের জন্য নববধূর সাথে দুর্ব্যবহার করা হয় এবং তার সাথে সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়। এগুলো শুধু শরীয়ত ও নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকেই যে নিন্দনীয় তা নয়, বরং এগুলো জাহেলী যুগের বর্বরতা-হিংস্রতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কারণ সে যুগে সম্পদকে দেবতা মনে করে পূজা দেওয়া হতো এবং তা অর্জনের জন্য যেকোন ধরনের পন্থা অবলম্বনকে বৈধ মনে করা হতো।

ঠিক এভাবেই তালাকের ক্ষেত্রে, মীরাস বণ্টনের ক্ষেত্রে, জীবন-সঙ্গিনীর অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে, তার সাথে সদাচার করার ক্ষেত্রে এবং জীবনের দিকে দিকে অসংখ্য ত্রুটি মুসলিম সমাজে ও মুসলিম পরিবারে প্রবেশ করেছে। এ সকল ত্রুটি ইসলামী সমাজব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও মহত্ত্বকে ধ্বংস করে দিয়েছে। এর ফলে অসংখ্য সংকট জন্ম নিচ্ছে। আর এ সবকিছুই হচ্ছে শুধুমাত্র ইসলামের সাথে গাদ্দারী ও অজ্ঞতার কারণে। অথচ আল্লাহ তা'আলা এ সকল বস্তুকে মানবজাতির জন্য নিয়ামত হিসেবে প্রদান করেছিলেন।

আসলে গর্হিত নানাপ্রকার সামাজিক রীতিনীতি ও জীবনপদ্ধতি ইসলামের ব্যাপকতা ও চিরন্তনতার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে এবং ইসলাম যে একটি স্বভাবগত ধর্ম ও আল্লাহ-প্রদত্ত একটি নিয়ামত – তার উপর পর্দা ফেলে দিয়েছে। আর এ কারণে মুসলিম সমাজে শত শত পেরেশানী ও সংকট, বেহায়াপনা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে।

তাই এ মুহূর্তে বিশ্বব্যাপী একটি সমাজসংস্কারমূলক কর্মপন্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। সুস্পষ্টভাবে এ আয়াতের আলোকে সকল মুসলমানকে পরিপূর্ণ ইসলামকে গ্রহণ করার দাওয়াত দিতে হবে; যেখানে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ص وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ط اِنَّهُوْ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ •

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইসলামের ভিতর পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পশ্চাতে চলবে না। কারণ সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" – সূরা বাকারা : আয়াত ২০৮।

৯. ইসলামী সালিশকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা

বর্তমান পরিস্থিতিতে গুরুত্বের সাথে ইসলামী সালিশকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা জরুরী। এ ব্যাপারে শীঘ্র পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এখানে এসে মুসলমানেরা তাদের পারিবারিক সমস্যা ও সংকট এবং পরিবারে ঘটে যাওয়া ঘটনাসমূহের ইসলামী বিধান জানতে পারবে। অতঃপর ইখলাস ও দৃঢ়তার সাথে এবং সওয়াবের নিয়াতে ইবাদত মনে করে তার উপর আমল করবে। এর মাধ্যমে দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়া ও ব্যয়বহুল কার্যক্রম থেকে বাঁচতে সক্ষম হবে। আর সব থেকে বড় বিষয় হল এর মাধ্যমে মুসলমানেরা শরিয়তের বিরোধিতা করা থেকে মুক্তি পাবে। কারণ বর্তমান আদালতে এর সম্ভাবনাই বেশী। কেননা বহুবার এধরনের অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে। আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, ইসলামী বিচারের কারণে উভয় পক্ষই এ সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে পরস্পর আলিঙ্গন করেছে। আর এর ফলে পরস্পরের মাঝে দীর্ঘদিনের মতবিরোধ নিরসন হয়ে গেছে। অন্যদিকে এর বিচার মেনে নেয়ার কারণে তারা উভয়ে অন্যান্য ইবাদতের মতই সওয়াব লাভ করবে। কারণ তারা এর মাধ্যমে আল্লাহর বিধানের সামনে আত্মসর্মপণ করেছে। আবার এর মাধ্যমে তারা আল্লাহর ঐ হুকুমের অবাধ্য হওয়া ও বিরোধিতা করা থেকে মুক্তি পাবে, যার ব্যাপারে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হচ্ছে,

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ •

"যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা সম্পাদন করে না, সে ফাসেক – অবাধ্য।" – সূরা মায়েদা : আয়াত ৪৭।

এ লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে ইসলামের পারিবারিক আইন অনুসারে ইসলামী সালিশকেন্দ্রে ফয়সালা সম্পাদিত হওয়া উচিত।[৬]

[৬] লেখকের সংকলিত 'ইসলামের পারিবারিক আইন' দ্রষ্টব্য।

১০. ইসলামী শরিয়তের অনুসরণ ও বাস্তবায়ন

ইসলামের খেদমত ও বিশ্বমানবতার সৌভাগ্যের একটিই মাত্র পথ রয়েছে। আর তা হল প্রিয়নবী (স.), খুলাফায়ে রাশেদীন ও মুজাদ্দেদগণের কর্মপন্থার উপর আমল করা। সেই পথ হল দুনিয়াতে ইসলামী শরীয়ত ও খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা। ইসলামকে রূহানী ও আখলাকী, বৈষয়িক ও রাজনৈতিক ভাবে বিজয়ী করার চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালানো।

মুসলমানদের মনজিলে মকসুদে পৌঁছার একটিই মাত্র পথ। এ পথ ধরেই উম্মতের প্রথম কাফেলা গন্তব্যে পৌঁছে গেছে।

لَنْ يُصْلِحَ أَخِرُ هَاذِهِ الْأُمَّةِ اِلَّا مَا صَلَحَ اَوَّلُهَا •

"এ উম্মতের পরবর্তিদের ইসলাহ ঐ পথেই হতে পারে যে পথে পূর্ববর্তিগণ ইসলাহ লাভ করেছিলেন।" আর তা হল খালেস দীনের অনুসরণ ও তা বাস্তবায়ন করা।[৭]

১১. নতুন দাওয়াত ও নতুন গবেষণা প্রতিষ্ঠান

আমাদের ওপর দিয়ে এমন এক শতাব্দী অতিবাহিত হয়েছে যে, ইউরোপ আমাদের মেধা ও যুব সমাজকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছে এবং আমাদের দিল ও দেমাগে সন্দেহ, নাস্তিকতা, বিশ্বাসঘাতকতা, ঈমান ও গায়েবী শক্তির প্রতি অনাস্থার বীজ বপন করে দিয়েছে। তদস্থলে নতুন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দর্শনের প্রতি পূর্ণ আস্থা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। অন্যদিকে আমরা তাদের মুকাবেলা করা হতে গাফেল হয়ে আমাদের কাছে যা কিছু আছে তাতে আত্মতৃপ্তি বোধ করি এবং নতুন নতুন আবিষ্কারের ক্ষেত্রে অকেজো হয়ে পড়েছি। তাদের দর্শন, মতবাদ, ব্যবস্থাপনাকে বোঝা এবং বুঝে তাত্ত্বিক পর্যালোচনা করে দক্ষ ডাক্তারের মত অপারেশন করার প্রয়োজন মনে করিনি, যদি কিছু হয়েও থাকে তা হয়েছে তাড়াহুড়া করা আমাদের পুরাতন গবেষণানির্ভর কিছু অসার কাজ। ফলে শতাব্দীর এ দ্বারপ্রান্তে এসে আমরা এক ভয়ানক পরিস্থিতির সম্মুখীন হলাম যে, মুসলিম বিশ্ব আজ ঈমান-আকীদার ক্ষেত্রে নড়বড়ে। আর মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্র ক্ষমতায় এমন এক প্রজন্ম

৮ম ও ৯ম করণীয় লেখকের ভিন্ন রচনা, তথা 'জুহদে মুসালসাল' পৃষ্ঠা ২১৯-২২৬ থেকে সংকলিত।

[৭] ৭ম ও ১০ম করণীয় লেখকের অন্য একটি রচনা, তথা 'জুহদে মুসালসাল' পৃষ্ঠা ৮১-৮৩ থেকে সংকলিত।

অধিষ্ঠিত যারা ইসলামের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসের ওপর আস্থা রাখে না। ইসলামের জন্য তাদের মাঝে কোনো উৎসাহ-উদ্দীপনা নেই। দীনদার মুসলমানদের সাথে তাদের সম্পর্ক হলো কেবল মুসলিম জাতি হিসাবে বা কোনো রাজনৈতিক স্বার্থের কারণে। ধর্মহীন এ ধ্যান-ধারণা ও মানসিক অবস্থা সর্বস্তরের জনগণের কাছে পৌঁছে গেছে সাহিত্য-সংস্কৃতি, সাংবাদিকতা ও রাজনীতির মাধ্যমে। ফলে এ মুসলিম সমাজ যার মাঝে আছে সব ধরনের কল্যাণ ও যোগ্যতা, বরং মুসলিম জাতিই হলো বিশ্ব জনগোষ্ঠীর মাঝে অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন জাতি, ঐ শ্রেণীর মানুষের গোলামে পরিণত হয়েছে তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি, মেধা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে।

সুতরাং যদি এ অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয় তাহলে ধর্মহীনতা ও ফাসাদ এ উম্মতের প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে। পৌঁছে যাবে ঐ সকল মানুষের কাছেও যারা কল-কারখানা, ক্ষেত-খামার করে বা গ্রাম-পল্লীতে বসবাস করে। ফলে তারাও ধর্মহীনতা ও নাস্তিকতার দিকে পা বাড়াবে। ফলে ইউরোপে যা ঘটেছে এশিয়ার দেশগুলোতে তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে, যদি এ অবস্থা চলতে থাকে এবং আল্লাহ্‌র অন্য কোনো এরাদা না থাকে।

আর এ কারণে ইসলামী জগত এক নতুন ইসলামী দাওয়াতের প্রয়োজন অনুভব করছে। আর এ দাওয়াত ও কর্মীদের স্লোগান হবে "এসো! ইসলামের দিকে নতুনভাবে।" এ ক্ষেত্রে শুধু স্লোগানই যথেষ্ট নয়, বরং কাজের পূর্ব শর্ত হলো দৃঢ় সংকল্প ও স্থির গভীর ভাবনা যে, কিভাবে আমরা এ শিক্ষিত শ্রেণীর কাছে নতুন উদ্দীপনা নিয়ে পৌঁছতে পারি। তাদের মাঝে প্রজ্জ্বলিত করা যায় ঈমানের স্ফুলিঙ্গ, ইসলামের প্রতি আত্মবিশ্বাস। কিভাবে আমরা তাদেরকে মুক্ত করতে পারব পাশ্চাত্য দর্শন, বর্তমান সভ্যতা ও তাদের ধর্মহীন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যাদের হাতে আছে বর্তমান রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও জীবনের চালনা শক্তি।

এ দাওয়াতের জন্য এমন সব লোকের প্রয়োজন যারা এর জন্য তাদের জ্ঞানগত যোগ্যতা, শক্তি-সামর্থ্য সব কিছুকে বিসর্জন দিতে সক্ষম এবং এর বিনিময়ে পদমর্যাদা, ইজ্জত বা সম্মান, চাকুরি, রাষ্ট্র ক্ষমতার আশা করে না। কারো সাথে হিংসা পোষণ করে না, বরং তারা মানুষের কল্যাণকামী, কিন্তু মানুষের থেকে কোনো কল্যাণ কামনা করে না। তারা দান করতে জানে, গ্রহণ করতে জানে না। যে জিনিষের প্রতি মানুষ লোভাতুর এবং জীবন বাজী রেখে তা পেতে চায়, তা পাওয়ার জন্য তারা প্রতিযোগিতা করে না, যাতে তাদের বিরুদ্ধে স্বার্থহাসিলের কোনো অপবাদের সুযোগ না থাকে এবং শয়তান তাদেরকে প্ররোচিত করার কোনো পথ না পায়। ইখলাস হলো তাদের সম্বল; প্রবৃত্তি পূজা, অহমিকা এবং সব ধরনের স্বজনপ্রীতি হতে তারা মুক্ত।

বর্তমান মুসলিম বিশ্বের প্রয়োজন একটি মননশীল গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হবে শক্তিশালী ইসলামী সাহিত্য উপহার দেওয়া; যার মাধ্যমে শিক্ষিত যুব সমাজকে নতুনভাবে সার্বজনীন ইসলামের দিকে ফিরিয়ে আনা যাবে। এই সাহিত্য তাদেরকে মুক্ত করবে পাশ্চাত্যের গোলামী থেকে যার প্রতি অনেকে জেনে বুঝে আত্মসমর্পণ করেছে; আর অধিকাংশই কালের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। ঐ ইসলামী সাহিত্য তাদের চিন্তা-চেতনায় নতুনভাবে ইসলামের বুনিয়াদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে এবং তাদের হৃদয়-আত্মার খোরাক হবে। এ কাজের জন্য মুসলিম দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে এমন দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন যারা এ লড়াইয়ের ময়দানে আত্মোৎসর্গ করতে প্রস্তুত।

১২. দরদী জামা'আত

আমাদের ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ দু'দলে বিভক্ত হয়ে আছে; যদি ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ বলা বৈধ হয়। কারণ ইসলামে ধর্মযাজক বা ধর্মীয় ব্যক্তি বলে কোনো দল নেই। তাদের একদল পাশ্চাত্য সভ্যতার সামনে আত্মসমর্পণ করেছে। আরেক দল এ সভ্যতার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতদেরকে কাফের মনে করে, তাদের সাথে দূরত্ব বজায় রাখে। তদুপরি তারা পাশ্চাত্যবাদীদের এ ধর্মহীন মনোভাব ও সভ্যতা-সংস্কৃতির কারণও খতিয়ে দেখতে চায় না। তাদের অবস্থা পরিবর্তন করা, ইসলাম সম্পর্কে তাদের বিরূপ ধারণার সংশোধন করা এবং ইসলামের সাথে তাদের সংঘাতময় অবস্থার পরিবর্তন করার চেষ্টা করে না। মেলামেশার মাধ্যমে ইসলাম ও দীনী ব্যক্তিবর্গের প্রতি তাদের ভীতি ও অশ্রদ্ধাবোধ দূর করে তাদের কাছে যা কিছু ঈমান ও আমল আছে তাকে চাঙ্গা করে না।

এ দ্বিতীয় দলটি শক্তিশালী আবেদনশীল ইসলামী সাহিত্য প্রণয়ন করে শিক্ষিত সমাজের মানসিক খোরাক দেওয়া ও তাদের দীনী চেতনা জাগ্রত করার প্রয়োজনই বোধ করে না। তারা তাদের ধন-সম্পদ, শক্তি-সামর্থ্য, ক্ষমতা-পদমর্যাদা ও জীবনোপকরণের প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করে তাদেরকে ইসলামী মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলার প্রতি যত্নবান হয় না। দরদ ও ব্যথা নিয়ে তাদেরকে প্রজ্ঞাপূর্ণ নসীহত করার প্রয়োজন মনে করে না।

অন্যদিকে প্রথম দলটি পাশ্চাত্যবাদীদের সহযোগিতা করে, তাদের ধন-সম্পত্তিতে শরীক হয়, তাদের দুনিয়া থেকে উপকৃত হয়; কিন্তু এ নৈকট্য ও সহযোগিতার ওপর ভিত্তি করে তাদেরকে দীনী কোনো কল্যাণ দেওয়ার ফিকির রাখে না। ফলে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে না আছে কোনো দাওয়াত, না আছে কোনো

আকীদা-বিশ্বাস, না আছে ধর্মীয় অনুভূতি, না আছে আত্মশুদ্ধির কোনো ফিকির, কোনো দীনী পয়গাম।

এ প্রেক্ষিতে প্রয়োজন তৃতীয় এক জামাত। যারা এ অবস্থার ওপর ব্যথিত হবে, কষ্ট বোধ করবে এবং এ কথা মনে করবে যে, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণী অসুস্থ, চিকিৎসার মাধ্যমে ভাল হতে পারে এবং তারা সুস্থ হতে প্রস্তুত। তাই তারা তাদের কাছে হিকমত ও কোমল ব্যবহারের মাধ্যমে দাওয়াত পৌঁছায়, নিঃস্বার্থ নসীহত করে। আর তাদেরকে মুসলিম উম্মাহর হারানো সম্পদ মনে করে। কারণ এ শ্রেণীর মানুষ দীন ও দীনী পরিবেশ হতে ছিল বিচ্ছিন্ন। তারা জীবন যাপন করত দীন থেকে দূরে সরে এবং দীনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে। ফলে তাদের দীন ও দীনী পরিবেশের সাথে দূরত্ব বেড়ে গেছে। তাদের এ অবস্থা আরো বাড়িয়ে দেয় এক শ্রেণীর দীনদার মানুষ যারা তাদের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নেয়। তাদের থেকে নেতৃত্ব কেড়ে নিতে চায় এবং তাদের পদমর্যাদা ও সম্মান অধিকার করতে প্রতিযোগিতা করে। ফলে এ অবস্থা দীনের প্রতি ভয় ও হিংসার সৃষ্টি করে। কারণ মানুষের স্বভাব হলো, যদি সে দুনিয়াদার হয় তাহলে যে তার দুনিয়া কেড়ে নিতে চায় তাকে সে ঘৃণা করা। যদি ক্ষমতা ও নেতৃত্বের লোভী হয়, তাহলে যে এ ময়দানে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে তাকে সে বাঁকা চোখে দেখবে। আর যদি সে ভোগ বিলাসী ও প্রবৃত্তির গোলাম হয়, তাহলে যে তার প্রতি চ্যালেঞ্জ করবে তার প্রতি সে ক্ষিপ্ত হবে।

আজ মুসলিম বিশ্বের প্রয়োজন এমন এক জামা'আত, যারা হবে সকল প্রকার লোভ-লালসার ঊর্ধ্বে, নিঃস্বার্থ ধর্ম প্রচারক। তারা নিজের জন্য বা আত্মীয়-স্বজন ও নিজ দলের জন্য সম্পদ হাসিল করতে চায় না। রাষ্ট্রক্ষমতা কুক্ষিগত করা তাদের কামনা নয়। বরং তারা এ ধারণার ঊর্ধ্বে। পাশ্চাত্য দর্শন, সভ্যতা-সংস্কৃতি বা ধর্মীয় ব্যক্তিদের ভুল বা ভুল বোঝাবুঝির কারণে অথবা ইসলাম ও ইসলামী পরিবেশ থেকে দূরে থাকার কারণে শিক্ষিত সমাজে যে মানসিক ও চিন্তাগত জটিলতা ও সংশয় জন্ম নিয়েছিল তারা তা নিরসন করতে চায়।

আর ব্যক্তিগত যোগাযোগ, দেখা-সাক্ষাৎ, বন্ধুত্ব ও সুসম্পর্ক, আলোচনা, সফর, শক্তিশালী ইসলামী সাহিত্য, পরিচ্ছন্ন ও মননশীল আখলাক-চরিত্র, প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব, দুনিয়াবিমুখিতা, নির্লোভ মানসিকতা এবং নবীগণ ও তাঁদের উত্তরসূরিদের চরিত্র মাধুর্য ধারণ করার মাধ্যমে এ সংশয়-জটিলতা নিরসন করা সম্ভব।

বস্তুত এরাই হলো এমন এক জামা'আত যারা প্রতিটি যুগে ইসলামের সঠিকভাবে খেদমত করেছে। উমাইয়া শাসনের গতিধারা পাল্টে দেওয়া এবং খলীফারূপে হযরত উমর ইবন আবদুল 'আযীযের (র.) আত্মপ্রকাশ ও তাঁর সফলতার পেছনে এ জামা'আতেরই অবদান। আবারও এই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি

ঘটে শক্তিশালী মোগল বাদশাহ জালালুদ্দীন আকবরের শাসনামলে। যে আকবর ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল এবং দৃঢ় সংকল্প করেছিল চার শত বছর ইসলামী শাসনে লালিত-পালিত ভারতকে ব্রাহ্মণ্যবাদী জাহেলিয়াতের দিকে নিয়ে যেতে। কিন্তু প্রজ্ঞাময় এ জামা'আতের কারণে ও মহান ইসলামী সংস্কারক মুজাদ্দিদে আলফেছানী ও তাঁর ছাত্রদের প্রভাব, হেকমত, দক্ষতা, বিচক্ষণতা ও দাওয়াতের কারণে সেদিন ইসলাম আকবরের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিল, বরং ভারতে আগের চেয়ে অধিক শক্তিশালী ও সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যাঁরা পূর্বসূরিদের তুলনায় অধিকতর ভাল ও ইসলামপ্রিয় ছিলেন। অবশেষে তার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন আওরঙ্গযেবের মত এমন এক মহান ব্যক্তি যাঁর আলোচনা ইসলাম ও ইসলামী ইতিহাসের জন্য গর্ব ও সৌন্দর্যের প্রতীক।[৮]

আর দেরী নয়

সুতরাং এগুলো এমন অপরিহার্য দায়িত্ব যা পালনে একদিন বা এক মুহূর্ত দেরী করাও সম্ভব নয়। রাসূলের (সা.) মীরাছ, তথা ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও নীতি-নৈতিকতা হেফাজতের জন্য ইসলামের বীর সৈনিকেরা মরণপণ সংগ্রাম করেছিলেন। এখন অবহেলায় যদি তা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে মুসলিম বিশ্বের অস্তিত্বও বিলীন হয়ে যাবে। সুতরাং যাদেরকে ইসলামের এ নাযুক পরিস্থিতি ভাবিয়ে তুলেছে তারা যেন এ বাস্তব বিষয়গুলো গুরুত্ব ও অধ্যবসায়ের সাথে গ্রহণ করেন।

---

[৮] শেষ দুটি করণীয় লেখকের 'রিদ্দাতুন ওয়ালা আবাবাকরা লাহা' আরবী প্রবন্ধ থেকে সংকলিত।